পেট্রোবাংলার কোম্পানি

যমুনা অয়েলে চলছে হরিলুট

টি'বয় ও দারোয়ান চালায় কোম্পানি

ব্যাবস্থাপনা পরিচালক আহম্মেদ জামান খান

মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব

সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যমুনা অয়েল কোম্পানিতে চলছে হরিলুট। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহম্মেদ জামাল খান চৌধুরীর নেতৃত্বেই এই কোম্পানিতে হরিলুট চলার অভিযোগ উঠেছে। ১৫টি ডিপোর সকল ইনচার্জ কর্তাব্যক্তিরা হলেন এমডির আস্থাভাজন লোক। প্রত্যেক ডিপোর ইনচার্জের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক দুর্নীতির মামলা। তারপরও তারা বহাল তরিয়তে থেকে তেল সরিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন। কোম্পানির অন্য বড় বড় কর্তাব্যক্তিরাও হলেন এমডির নিকটতম লোক। আহম্মেদ জামাল খান চৌধুরীর প্রথম আস্থাভাজন ব্যক্তিটি হলেন ডেপুটি পার্সোনাল ম্যানেজার মোঃ শহীদ হোসেন মিয়া। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ শহীদ হোসেন মিয়া ভুয়া সনদপত্র দিয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তে বিষয়টি ধরা পড়লেও অদৃশ্য শক্তির বলে শহীদ হোসেন মিয়ার কিছুই হয়নি।

১৯৯১ সালের ১২ মার্চ দি বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। পার্সোনাল এক্সিকিউটিভ (প্রশাসন) বিভাগে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়, পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টের ওপর ডিপ্লোমাসহ এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শহীদ হোসেন মিয়া ১১ নবেম্বর ১৯৯১ সালে উক্ত পদে যোগদান করে। চাকরির ১০ বছরের মাথায় ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। শহীদ হোসেন মিয়া প্রকৃতপক্ষে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট নয়। কোম্পানির জিএম মোহাম্মদ আলী ৮ অক্টোবর ২০০৩ সালে ডাইরেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টকে (বিআইএম) প্রকৃত ঘটনা জানানোর জন্য পত্র দেয়। জবাবে ২২ অক্টোবর বিআইএম-এর সদস্য সচিব (কার্যনির্বাহী কমিটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স) জিএম মোহাম্মদ আলীকে জানানো হয়, ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে উক্ত ইনস্টিটিউট থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় মোঃ শহীদ হোসেন মিয়া অকৃতকার্য হয়। পাশাপাশি যমুনা অয়েল কোম্পানির দুই বড় কর্মকর্তার নেতৃত্বে তদন্ত টিম গঠন করা হয়। মোঃ ফেরদাউস করিম (অপারেশন ম্যানেজার চট্টগ্রাম অফিস) ও সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন (রেসিডেন্ট ম্যানেজার ঢাকা অফিস) গত ২৯ ডিসেম্বর '০৩ জি এম বরাবর তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন শহীদ মিয়া ভুয়া সনদপত্র দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে চাকরি নেয়। তদন্তের আলোকে ৩ জানুয়ারি '০৪ কোম্পানির বোর্ড মিটিং-এ (জিএম বোর্ড-১১৯) শহীদ হোসেন মিয়াকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব করা হয়। শেষ পর্যন্ত শহীদ হোসেন মিয়াকে বরখাস্ত করার পরিবর্তে জিএম মোহাম্মদ আলীকে বিপিসিতে বদলি করা হয় এমডি আহম্মেদ জামাল খান চৌধুরীর ইশারায়। সাবেক জিএম মোহাম্মদ আলী ২০০০কে জানান, 'ডেপুটি পার্সোনাল ম্যানেজার শহীদ হোসেন মিয়ার ভুয়া সনদপত্র দিয়ে চাকরি নেয়ার ঘটনাটি তার হস্তক্ষেপে ধরা পড়ার কারণে তাকে বিপিসিতে বদলি করা হয়। ভুয়া সনদপত্রের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে যাচ্ছে মোহাম্মদ শহীদ হোসেন মিয়া। তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বরং বদলি হতে হলো। এভাবেই চলছে যমুনা অয়েল কোম্পানি।'

শহীদ হোসেন মিঞা
ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে ১৫ বছর চাকরি করছেন

মোহাম্মদ আলী
সাবেক জিএম

ভুয়া সনদ দিয়ে প্রতাপের সঙ্গে চাকরি করে পদোন্নতি পেয়ে শহীদ মিয়া বর্তমানে ডেপুটি পার্সোনাল ম্যানেজার। এমডির অন্য সহযোগীরা হলো চট্টগ্রাম বিভাগীয় ব্যবস্থাপক আহম্মেদ নূর, যিনি প্রথম একজন কন্ট্রাক্টরের ক্যাজুয়াল টাইপিস্ট পদে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মদক্ষতা না থাকলেও এমডির ক্ষমতার বদৌলতে তিনি আজ পদোন্নতি পেয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক। তাছাড়া এমডির আশীর্বাদে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা নূরুল হক কেরানি থেকে ম্যানেজার পদে, আবুল বাশার টিবয় থেকে সিনিয়র অপারেশন অফিসার পদে, দারোয়ান আঃ মান্নান পার্সোনাল অফিসার পদে এবং অফিস সহকারী থেকে

এমডির তিন সহযোগী : আজিজুর রশীদ, নুর দিন আহমদ আল মাসুদ ও মোঃ শামসুল আরেফিন

আহমেদ নর
দারোয়ান থেকে ম্যানেজার

সাইফুদ্দিন
সিবিএ নেতা

এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে কাজী সফিক উদ্দিনকে পদোন্নতি দেয়া হয়। টিবয় দারোয়ানদের পদোন্নতি দিয়ে তাদের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি। এমডির বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে আরো জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে পার্সোনাল ম্যানেজার আজিজুর রশিদ, বাঘাবাড়ি, ফতুল্লা ও চাঁদপুর ডিপোর ইনচার্জ যথাক্রমে আবুল বাসার সামসুল আরেফিন ও নূরুদ্দিন আল মাসুদ।

এদের মধ্যে সামসুল আরেফিন ও নূরুদ্দিন আল মাসুদ ফতুল্লা ডিপোর পরিবহনকারী একটি জাহাজ থেকে তেল চুরির দায়ে ফতুল্লা থানার একটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি মামলা নং- ২০(২২) ২০০১ ধাঁরা ৪০৬/১০৯। অন্যদিকে আবুল বাসার বিপিসির ৫০ লাখ টাকা আত্মসাৎকারী হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া তিনি নিজ স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করার মামলারও আসামি। পাশাপাশি এদের তিনজনের নামে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে মামলা রয়েছে। (সূত্র বিএএস, নথি নং- ডিএবিই আর নং-৭৫/২০৩/টাঃ ফোঃ- ২ তাং ২১/১২/২০০৩ ইং) এসব দুর্নীতিবাজ ছাড়া এমডির নিজস্ব দুই ক্যাডারও উক্ত কোম্পানিতে চাকরি করেছে। এদের মধ্যে আবু সালাম (অপারেটর) ও ফজলুর রহমান। দুজনই চট্টগ্রাম টার্মিনাল অফিসে কর্মরত। আবু সালাম অদ্যাবধি নিজের নাম দস্তখত করতে না পারলেও তিনি এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। চট্টগ্রাম নেভি হেড কোয়ার্টার এবং হাসপাতালের বিপরীত পাশে বিশাল বিল্ডিংয়ের মালিক। জানা যায়, নামে-বেনামে বিভিন্ন ব্যাংকে তার রয়েছে কোটি কোটি টাকা।

ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ফজলুর রহমানের রয়েছে চট্টগ্রামের আলোচিত অবৈধ ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার আসামি বর্তমানে জেলহাজতে থাকা ইয়াকুব আলীর সঙ্গে গভীর সখ্য। এক মঞ্চে, ইয়াকুব এবং ফজলুর রহমানের বিভিন্ন মিটিংয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ। এ বিষয়ে স্থানীয় দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত হয়েছে একাধিক রিপোর্ট।

এদিকে শহীদ হোসেন মিয়া ও সামসুল আরেফিনকে প্রাইভেটকার ক্রয়ের জন্য দু'লাখ টাকা করে ঋণ মঞ্জুর করছে যমুনা। পাশাপাশি প্রতি মাসে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মাসিক এগারো হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। এমডি আহম্মেদ জামাল খান চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ২০০০কে জানান, '২০০৩ সালের ১০ মার্চ বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬০ মাসে পরিশোধযোগ্য মোট নয়জনকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা করে ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ তিনি অকপটে অস্বীকার করেন।' ডেপুটি পার্সোনাল ম্যানেজার শহীদ হোসেন মিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে নারাজ।

যমুনা কোম্পানির অসৎ কর্মচারীদের কারণে গত ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। কিন্তু এমডির জন্য বরাদ্দ রয়েছে চারটি গাড়ি ও আলীশান বাড়ি। উক্ত কোম্পানির নিজস্ব কাঠামো থাকলেও সেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এমডির ইচ্ছেমত সব কার্যকলাপ চলছে। ২০০১ সালের ১১ নবেম্বর থেকে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কোম্পানিতে নিয়োগ ও বদলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু এমডি বদলির পরিবর্তে পদায়ন এবং নিয়োগের পরিবর্তে ক্যাজুয়াল বলে চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২৩ জুন '০৪ পার্সোনাল ম্যানেজার আজিজুর রশিদ পাঁচজনকে পদায়ন করেন। এদের মধ্যে বাবুল সিকিউরিটি চট্টগ্রাম টার্মিনাল অফিস (পিএম/৯৬০/৩৪৩/) গ্রুপ-১ নজরুল ইসলাম এসিস্ট্যান্ট অপারেশন অফিসার (ঐ পিএম ৯৫৮/১০২৭/এম-৭) এবং সিরাজুল ইসলাম পাম্প অপারেটর নাটোর (পিএম নং-৯৬০/৪৩১/গ্রুপ-১) এদেরকে ফতুল্লা ডিপোতে পদায়ন করা হলো। অন্যদিকে পরিচালনা ব্যবস্থাপক মোঃ ফেরদাউসুল করিম গত ১৩ এপ্রিল '০৪ চট্টগ্রাম অফিসের পিয়ন আবুবক্কর সিদ্দিককে ফতুল্লা ডিপোতে ছাড়পত্র দেয়া হয়।(পিএম ৯৬০/৩৬৩/গ্রুপ-১)। পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে চট্টগ্রাম অফিসে পিয়ন নিয়োগ দেয়ার জন্য বলা হয়।

যমুনা অয়েল কোম্পানিটি জালানি তেলের পাশাপাশি কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক আমদানি করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রিপ্যাকিং করে তরল এবং দানাদার কীটনাশক বাজারজাত করে। কোম্পানির এই কাজটি ছিল আর্থিকভাবে লাভজনক। এই এগ্রো-কেমিক্যাল প্লান্টটি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানে কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন এবং বাজারজাত করার লক্ষ্যে জনবল উৎপাদন কারখানা একজন বিভাগীয় প্রধান প্রতিটি বিভাগে বাজারজাত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন কর্মকর্তা কর্মচারী অফিস স্থাপনা থাকা সত্ত্বেও কি কারণে এমডি তা বন্ধ করে দিলেন তা এখনো কর্মচারীদের কাছে অজানা।

আরো অভিযোগ উঠেছে এমডি আহম্মেদ জামাল খান চৌধুরী উক্ত কোম্পানির অপর চার পরিচালক যথাক্রমে এহসান উল্লাহ ফাত্তাহ (অতিরিক্ত সচিব), একেএম জাফর উল্লাহ খান, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, এবিএম আবুল কাশেম পরিচালক যুগ্ম সচিব (প্রবিধি) অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়, গোলাম মোস্তফা কামাল পরিচালক (পরিচালন) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদা মন্ত্রণালয়। এরা প্রত্যেকে যমুনা অয়েল কোম্পানিতে হরিলুটের ব্যাপারে অবগত হলেও তারা সকল অপকর্ম সহ্য করে যাচ্ছে নিজেদের স্বার্থের কারণেই।

যমুনা কোম্পানির অসৎ কর্মচারীদের কারণে গত ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। কিন্তু এমডির জন্য বরাদ্দ রয়েছে চারটি গাড়ি ও আলীশান বাড়ি। উক্ত কোম্পানির নিজস্ব কাঠামো থাকলেও সেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এমডির ইচ্ছেমত সব কার্যকলাপ চলছে। ২০০১ সালের ১১ নবেম্বর থেকে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কোম্পানিতে নিয়োগ ও বদলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু এমডি বদলির পরিবর্তে পদায়ন এবং নিয়োগের পরিবর্তে ক্যাজুয়াল বলে চালিয়ে যাচ্ছে